পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

আমাদের শিক্ষাগুরু

শিক্ষক বলতে যিনি শিক্ষা দেন এমন হলেও আমরা সাধারণভাবে আমাদের স্কুল-কলেজের মাস্টারদেরই বুঝি। শিক্ষক মানেই ভয়ের বিষয় আবার কোনও কোনও শিক্ষক একেবারে মনের মানুষ, যাকে মন খুলে সব কথা বলা যায়। একজন ছাত্রী বা ছাত্র যত দুষ্টুমি করুক বা পড়াশোনায় গাফিলতি থাকুক, কোনও অনৈতিক কাজ করলে সাধারণভাবে সে শিক্ষকের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে কথা বলতে পারে না। শিক্ষকরা আমাদের সমাজে নৈতিকতার মানদণ্ড। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মুল্যবোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের অজান্তেই আমাদের চেতনায় তাঁরা আদর্শ, নৈতিকতার যেন জীবন্ত মূর্তি। ন্যায়-অন্যায়ের বোধ শিক্ষকদের থেকেই জন্মায়। শুধু এই নৈতিকতাই বা কেন? শিক্ষক মানেই আমাদের কাছে এমন একজন মানুষ যার উপদেশ, পরামর্শ আমাদের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাঁদের ওপর ভরসা করতে পারি, তাঁদের কথা মেনে চলতে পারি। একজন ভালো শিক্ষকের প্রতি আমাদের আস্থার কারণেই পুথিগত বিদ্যা ছাড়াও যা-ই তাঁরা আমাদের শেখান বা বলেন আমরা তাই আত্মস্থ করি।

মালালা ইউসুফজাই বলেছেন, একটা বই, একটা পেন, একটা শিশু আর একজন শিক্ষক পৃথিবীটা পালটে দিতে পারেন।' শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা এই তিনটির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে থাকে। শিক্ষা ভালো-মন্দ বিচার করতে শেখায়।

এই ভালো-মন্দের বিচার মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। একটি সুস্থ শরীর ও মানসিকতার মানুষ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবেশ ও রাজনীতি-সহ সর্বত্র মানবজীবন হয়ে ওঠে এলোমেলো।

এই অস্থিতিকে স্থিতি বা অসংলগ্নতাকে এক সমীকরণে বেঁধে রাখার ভিত তৈরি করেন শিক্ষক। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে সমাজকে করতে পারেন আলোকিত ও উদ্ভাসিত। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একজন মানুষ বড় হয়ে কী কী করবে বা তার পছন্দ ও অপছন্দ-এসবের আদল বা গড়ন দেন। যদিও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। তবুও বলা যায় শিক্ষাগুরুর ঋণ কোনও মানুষ অস্বীকার করতে পারবে না। কত শিক্ষক আছেন যাঁদের জীবনের ধ্যানজ্ঞানই শিক্ষা। স্কুল কলেজ ছাড়াও নানাভাবে তাঁরা এই কাজই করে যাচ্ছেন। বই লেখা, যেসব পরিবারে শিক্ষার আলো পৌঁছয়নি সেখান থেকে ছেলেমেয়েদের টেনে আনা, পড়াশোনায় উৎসাহী করে তোলা, নিখরচায় পড়ানো-এরকম কত কিছু তাঁরা করে থাকেন। কত ছাত্র-ছাত্রী বিপদে পড়ে শিক্ষাগুরুর কাছে ছুটে যায় যাতে তাঁর শিক্ষায় কোনও ব্যঘাত না ঘটে।

স্কুল দেশের সচেতন তরুণ প্রজন্ম তৈরি করে। সেই দায়িত্ববোধ নিয়ে অনেক শিক্ষক

এরপর দু'য়ের পাতায়

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

পড়াশোনায় ভীতি নয়

শ্যামলী সুর প্রধান শিক্ষিকা, বেহালা কিশোর ভারতী গার্লস হাইস্কুল

পড়ুয়াদের বেশি চাপ না দিয়ে তাদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। পড়ুয়ারা যে বিষয়ে আগ্রহী তাদের সেদিকে যেতে দেওয়া উচিত। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভীতি কাটানোটা খুব জরুরি। শিক্ষিকাকে যদি ওরা ভয় পায়, তাহলে ওদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ জন্মাবে না। দরিদ্র পরিবার থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সমস্যা অনেক বেশি। নানান পরিস্থিতির কারণে হয়তো অভিভাবকেরাও তাদের যথোপযুক্ত সাহায্য করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়ুয়াদের সঙ্গে আরও সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা খুবই জরুরি। এছাড়া সবসময় যে পড়ুয়ারা খুব উচ্চমানের টিউশন পাচ্ছে এমনটা নয়। একরকম আমরা তাদের বলি টিউশন নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমার পরামর্শ নিজের পড়া নিজে যেন মন দিয়ে করো। আর কিছু অসুবিধে হলে তারা যেন স্কুল-শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলে। আমি চাই পড়ুয়ারা স্কুল থেকে সেই নির্ভরতা পাক। আমি অন্যান্য শিক্ষিকাদেরকেও একই কথা বলি যে শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে। ছাত্রছাত্রীদের যাতে ভালো হয়, আমরা সব সময় সেই চেষ্টা করি। বলব পাঠ্যবইটি খুব মন দিয়ে পড়তে। একজন পড়ুয়ার মানবিক বিকাশ ও তার সার্বিক গুণের দিকেও আমরা লক্ষ রাখি। নিজের জন্য খালি বেঁচে থাকা সেটা পরিপূর্ণ মানুষের লক্ষণ নয়। পড়াশোনার পাশাপাশি কালচারাল দিকও বিকশিত হওয়া খুব জরুরি।

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

বাড়িতে পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাস করি

সীমন্তি দত্ত নবম শ্রেণি, হোলি ফ্যামিলি গার্লস হাই স্কুল

সীমন্তির সঙ্গে কথা বললে একটা ব্যাপারই স্পষ্ট হয় যে সে পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সচেতন, নিজের লক্ষ্য, স্বপ্নপূরণের জন্যে কী কী করতে হবে তার পরিকল্পনা সে এখনই করে নিয়েছে। আর সেইমতো পড়াশোনাও করছে, সে-সব কথাই জানালো উত্তরণ-কে।

উত্তরণ: তোমার পড়াশোনা কোনও রুটিন মেনে করো?

সীমন্তি: স্কুলের রুটিন অনুযায়ী আমার বাড়িতে নিজের একটা রুটিন আছে। সকাল ৬-৯ স্কুল যাওয়ার আগে আর সন্ধেয় ৬-১০ বা ১১টা অবধি পড়াশোনা করি।

উত্তরণ: পড়ায় কোনওকিছু আছে যা তুমি রোজ করবেই।

সীমন্তি: রোজকার পড়া আমি রোজ করি, তা সে যে বিষয়ই হোক। স্কুলের পড়া ছাড়া নিজে কখনও পুরনো পড়া পড়ি আবার কখনও নতুন কিছু শিখি। আর যখনই নতুন কিছু শিখি আন্ডারলাইন করে রাখি।

উত্তরণ: কখন তোমার পড়াশোনা করার ভালো সময়?

সীমন্তি: সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে ৬টা থেকে ৯টা। এই তিন ঘণ্টা নতুন বিষয় পড়ি, রিভিশন দিই। বিকেলে টিউশন পড়া ৫.৩০-৬টা থেকে যদি থাকে তাহলে রাতে আবার ৯টা থেকে ১১টা নিজে পড়ি, প্র্যাকটিস করি।

উত্তরণ: তাহলে তো আর অন্য কিছু করার সময় থাকে না!

সীমন্তি: ড্রয়িং করতে ভালো লাগে। এর জন্যে সময় বার করেই নিই। গল্পের বই পড়তেও ভালো লাগে।

উত্তরণ: বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?

সীমন্তি: আমি ডাক্তার হতে চাই। গ্রামে চিকিৎসা করতে চাই। না হলে কোনও সরকারি কাজ করব।

উত্তরণ: পড়াশোনা কি বোঝা মনে হয়?

সীমন্তি: না ভালোই লাগে। ভৌতবিজ্ঞানের প্রোজেক্টের কাজ করতে আমার সবথেকে ভালো লাগে।

উত্তরণ: বাড়িতে কে বেশি পড়ায় সাহায্য করেন?

সীমন্তি: মা। সকালে মা সাহায্য করেন।

উত্তরণ: খুব ভালো লাগল কথা বলে। শুভেচ্ছা জানাই যেন তুমি অনেক উন্নতি করতে পারো।

দুইয়ের পাতায়
অনুপ্রেরণা
তিনের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
কম্পিউটারের ডাক্তারি ও জেনারেল নলেজ
চারের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ইতিহাস
ভূগোল
পাঁচের পাতায়
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ইতিহাস
ভূগোল
ছয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ
সাতের পাতায়
ক্যুইজ
এডু অ্যাডভাইস
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ

ঘূর্ণিঝড়

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০১৭

প্রত্যেক স্কুলের
ফার্স্টবয়-ফার্স্টগার্ল-রা
‘উত্তরণের মুখোমুখি:
রোল নং ওয়ান’
বিভাগে
যোগ দিতে পারো।

ফোন: 033 40605837
(১২টা থেকে ৬টা),
ই-মেইল: jugasankha.
suppli@gmail.com

অনুপ্রেরণা

তাঁতিগাছি সর্দারপাড়াকে শিক্ষার আলো দেখাল দুই ভাই

শর্মিলা চন্দ্র

শিক্ষক শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে আশিস ও বীরজু সর্দার

কয়েকদিন আগেই মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারেও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নিয়ে বেশ উন্মাদনাও হয়েছে। বলা ভালো প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকারীদের নিয়ে বেশ মাতামাতি হয়েছে। তারা খবরের শিরোনামে থেকেছে। এছাড়া এমন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও জীবনের বড় গণ্ডিটা পেরোতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে আমরা তাদের কথা জানতে পেরেছি। কিন্তু নদিয়ার চাকদহ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাঁতিগাছি সর্দারপাড়ার আশিস সর্দার ও বীরজু সর্দারের কথা হয়তো অনেকেরই অজানা। এই দুই ভাইও এবছর মাধ্যমিক পাস করেছে। ঘটনা হয়তো খুবই সাধারণ মনে হচ্ছে। কিন্তু তা নয়। কারণ এই প্রথম আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় স্বাধীনতার পর এই প্রথম ওই এলাকা থেকে দু’জন মাধ্যমিক পাস করল।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই তাঁতিগাছি সর্দারপাড়া। এখানে যাযাবর জাতির বাস। এদের জীবিকার মাধ্যম হল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পশুচারণ করা। একটা সময় ওদের কোনও স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। অনেক বছর আগে পশু চরাতে চরাতে তারা তাঁতিগাছি গ্রামে চলে আসে এবং তখন থেকেই এই গ্রামে তারা থাকতে শুরু করে। তবে বর্তমানে তাদের জীবিকা পশুচারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পশুচারণের পাশাপাশি প্রত্যেকেই নানারকম কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কেউ কান পরিষ্কার করে, কেউ আবার দিনমজুরের কাজ করে আবার কেউ নির্মাণ শ্রমিক। এদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়ার জন্য এর আগে কেউই স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। অনেকে হয়তো স্কুলের মুখ পর্যন্তও দেখেনি। কিন্তু সেই ধারাকে এবার ভেঙে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করল আশিস ও বীরজু সর্দার। খবর পাওয়া মাত্র গোটা গ্রামে উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। আশিস আর বীরজু দু’জনে রাউতাড়ি হাই স্কুলের ছাত্র। অভাব-অনটনকে সঙ্গী করে এই দুই ভাই সকলের কাছে বিশেষ করে তাঁতিগাছি সর্দারপাড়ার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত তৈরি করল।

আশিস ও বীরজুর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এরপর তারা কলা বিভাগে ভর্তি হতে চায়। কারণ ওই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ নেই। দু’জনেরই পছন্দের বিষয় বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল। দু’জনেই পড়াশোনা করে শিক্ষিত হতে চায়। তাদের স্বপ্ন স্কুল শিক্ষক হওয়ার নয়তো সরকারি অফিসে চাকরি করা।

ছেলের এরকম রেজাল্টে খুশি আশিস আর বীরজুর বাবা-মায়েরা। অভাবের সংসারে থেকেও তাদের ছেলেরা যে মাধ্যমিক পাস করবে সেটা তারা ভাবতেও পারেননি। তবে এরপর ওরা কীভাবে পড়াশোনা করবে এবং পড়াশোনা কতদূর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই নিয়ে তাঁরা বেশ চিন্তিত। সঙ্গে এটাও জানালেন, এতদিন শংকর স্যার তাদের ছেলেদের যেভাবে সাহায্য করেছেন সেটা না করলে ওরা মাধ্যমিক পাস করতে পারত না। প্রাইভেট টিউটার রাখার ক্ষমতা নেই। শংকর স্যারই ওদের যেভাবে বলেছেন, সেইভাবে পড়াশোনা করেছে।

প্রশান্ত ঘোষ মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন পরিচালিত অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক শংকর ঘোষ। আশিস, বীরজুর সম্পর্কে শঙ্করবাবু বলেন, ‘ওরা দু’জনেই খুব মেধাবী ছাত্র। অনেক ছোট থেকে ওদের আমি পড়াচ্ছি। আর্থসামাজিক কারণে এই গ্রামের কেউ স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। ওদের নিয়ে আমার একটা জেদ এবং স্বপ্ন ছিল ২০১৭-তে ওদের আমি মাধ্যমিক পাস করাব। আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ওরা গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ওরাই গ্রামকে শিক্ষার আলো দেখাল। কারণ, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথমবার গ্রাম থেকে দু’জন মাধ্যমিক পাস করল। ওদের আরও পড়াশোনা করতে হবে। অনেক বড় হতে হবে। আমি সব সময় ওদের সঙ্গে থাকব। ওদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করব।’

আমাদের শিক্ষাগুরু (প্রথম পাতার পর)

নিজেদের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যান। তাই ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করে তোলা আর শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এঁদের অবদান কিছু কম নয়। আজ অনেকে শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষায় রাজনৈতিক দখলদারি সম্পর্কে জোরালোভাবে আপত্তি ও প্রশ্ন তুলছেন। কিন্তু আপত্তি তাদেরকে নিয়েই যাঁরা শিক্ষাকে টাকা তৈরির কল হিসাবে দেখতে চান। কিন্তু এটা মানতেই হবে আমাদের আগামীদিনের প্রজন্ম যাতে সু-নাগরিক হিসাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়, তার জন্যও তাদের মাঝে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসার করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আর মূল্যবোধ লালন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন একজন ভালো শিক্ষক। শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে একভাবে সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ সঠিক দিশায় উজ্জীবিত করতে পারে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃঙ্খলা ও ঐক্য ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সুষ্ঠ রাখে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সামাজিক মূল্যবোধের রূপ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। দেশ, জাতি, সমাজ, কাল ও প্রকৃতিভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। যা ভালো, যা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে

কল্যাণকর, তার মূল্য আছে। ধর্ম, বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, জীবন দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ, যা আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে লালন করে থাকে সেসবই আমাদের মূল্যবোধের অন্তর্গত। শিক্ষক হলেন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে কেন্দ্র করেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীর মাঝে মূল্যবোধের প্রসার তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। শিক্ষককে বাদ দিয়ে সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও নৈতিক শিক্ষাও পরিপূর্ণতা আসতে পারে না। তিনিই মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দেন।

অথচ কত সময়ে আমরা এঁদেরকে কত অবমাননা করি, অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি। এমন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা ঋণ স্বীকারও করে না। তাই হয়তো আমাদের মূল্যবোধে টান পড়েছে। একজন সুশিক্ষকের শাসনকে অত্যাচার হিসেবে, তার উপদেশকে বাজে বকুনি বা তার নীতিশিক্ষাকে ‘ব্যাকডেটেড’ হিসাবে দেখলে আমরা নিজেরা নিজেদেরই ক্ষতি করব। অনেক শিক্ষক অভিযোগ করেন যে আজকালকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়। অনেক পড়ুয়া পাঠ্যবিষয় ইন্টারনেট বা প্রাইভেট টিউটরদের কাছ থেকে পড়ে নেওয়ায় তারা স্কুলে আসার প্রয়োজন বোধ করে না। তারা এটাই ভুল ভাবে যে একজন শিক্ষকের গুরুত্ব শুধু পাঠ্যবই পড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ধারণা বদলানো দরকার। একজন শিক্ষক সারা জীবনের জন্যে বন্ধুও হয়ে উঠতে পারেন। এমন এক সম্পর্ক যা আমাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত তৈরি করে। তাই সকলের মনে রাখা উচিত যে-শিক্ষকের প্রতি কর্তব্য পালন বা শ্রদ্ধা জানানো কিন্তু শিক্ষক দিবসে সেজেগুজে শিক্ষককে উপহার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে হয় না। জীবনে আমরা আমাদের আচরণবিধি, নীতিবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে যখন একজন খাঁটি মানুষের পরিচয় দিই। তখনই এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয়।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০১৭

কম্পিউটারের ডাক্তারি

কম্পিউটার ফরম্যাট না করে ভাইরাস দূর করার উপায়

সুজিত ভদ্র

আমরা সকলেই জানি উইন্ডোজ সেটআপ দিয়ে সিস্টেম ড্রাইভ অর্থাৎ যে ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা আছে সেটি ফরম্যাট করা হয়। অন্য ড্রাইভগুলো অপরিবর্তিত থাকে। ফলে সিস্টেম ড্রাইভে যদি ভাইরাস থাকে, তা ডিলিট হয়ে যায়, কিন্তু অন্য ড্রাইভের ভাইরাসগুলো আগের মতোই পিসিতে বাসা বেঁধে বসে থাকে। তার উপর এসব ভাইরাস যদি হয় এতই মারাত্মক যে, তার জন্য অ্যান্টিভাইরাসই ইনস্টল করা যায় না, তাহলে পিসির এসব ভাইরাস পিসিতেই থাকবে।

তাহলে কি পিসি ফরম্যাট করা (কম্পিউটারের সব ডাটা ডিলিট করে দেওয়া) ছাড়া কোনও উপায় নেই? অবশ্যই আছে। সাধারণত যে সকল ভাইরাস আপনার পিসিতে অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করতে দেয় না, তারা আপনার পিসিতে সক্রিয় আছে বলেই তারা আপনাকে অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করা থেকে বিরত রাখতে পারে। সুতরাং, এমন কিছু করতে হবে যেন, ভাইরাসগুলো সক্রিয় না থাকে।

পিসিতে ভাইরাস তখনই সক্রিয় হয়, যখন পিসির ড্রাইভগুলো ওপেন করা হয়।

যেমন, পিসিতে সিস্টেম ড্রাইভ ছাড়া অন্য ড্রাইভে ভাইরাস থাকলে, সিস্টেম ড্রাইভ ফরম্যাট করার পরও অন্য ড্রাইভগুলোতে ভাইরাসগুলো আবার সক্রিয় হবে। এখন যা করতে হবে...

১) প্রথমেই আপনি এক্সপি সেটআপ করতে হবে। তবে এখনই মাদারবোর্ডের সিডির সফটওয়্যারগুলো (সাউন্ড, ল্যান, চিপসেট, ভিডিও) ইনস্টল করবেন না।

৩) উইন্ডোজ সেটআপের পরে প্রথম যখন কম্পিউটারটি অন করবেন তখন My Computer-এ বা এর কোনও ড্রাইভেও যাবেন না। এর ফলে আপনার পিসির ভাইরাসগুলো সক্রিয় হবে না।

৪) এখন অ্যান্টিভাইরাসের সিডি অথবা পেনড্রাইব থেকে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি ইনস্টল করুন। পেনড্রাইভ কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর সময় shift প্রেস করে রাখুন যেন তা নিজ থেকেই ওপেন না হয়।

৫) এখন My Computer থেকে প্রত্যেকটি ড্রাইভ থেকে স্ক্যান করলেই ভাইরাসগুলো মুক্ত হয়ে যাবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে স্ক্যান করার আগে যেন কোনও ড্রাইভ ওপেন না হয়। এতে অন্য ড্রাইভের ভাইরাসগুলো সক্রিয় হয়ে যেতে পারে।

জেনারেল নলেজ

চশমা

মন্ত্রী কহেন, আমারও ছিল মনে/ কেমনে ব্যাটা পেরেছে সেটা জানতে? ... রবীন্দ্রনাথ জুতা আবিষ্কার লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর মতো চশমা আবিষ্কারের কথা কি কেউ লিখেছিলেন? কখনও কি চশমা আবিষ্কার হয়েছিল? কিন্তু চশমা ছাড়া অসুবিধা যে হত বহুবার ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বিখ্যাত রোমান বাগ্মী সিসেরোর অভিযোগ ছিল, ক্রীতদাসেরা তাঁকে কিছু পড়ে শোনাবে তা তাঁর মোটেও পছন্দ নয়। কিন্তু সেই সময় চোখের কারণে তিনি নিজে কিছু পড়তেও পারতেন না। সম্রাট নিরোর নাকি দেখতে অসুবিধা হত তাই তিনি একখণ্ড পান্নার ভিতর দিয়ে তাঁর প্রিয় গ্ল্যাডিয়েটরদের খেলা দেখতেন। এরকমই নানা গল্পের সন্ধান পাওয়া যাবে চারিদিকে। কিন্তু চোখের জন্য আরামদায়ক, স্বচ্ছ এমন কিছুর আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে। তবে এই সময় যে জিনিসটি ব্যবহার করা হত তা চশমা নয়, আতস কাচ। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েই পড়াশোনা হতো। ছোট জিনিস বড় করে দেখা হতো।

ভেনিসের মোরানো যা আজও কাচশিল্পের জন্য বিশ্ববিখ্যাত, তারাই প্রথম চশমা তৈরি করে। মানে মোরানো থেকে যেটি নির্মিত হয়েছিল সেটি চশমার মতোই। তখন তাকে বলা হত রিডিং এডস। কনভেক্স গ্রাউন্ড লেন্সে ফ্রেম দেওয়া হত। লোহা, কাঠ বা মোষের শিং দিয়ে তৈরি হত এই ফ্রেম। একটি মাত্র। এই চশমা বিভিন্ন ডিজাইনের হতো। একে বলা হতো মাউন্টেন স্টাইল।

প্রায় দুশো বছরের ক্রমবিবর্তনে চশমা তৈরি হল, যা আধুনিক চশমার পূর্বপুরুষ। আকার এবং ফ্রেম ও কাচের ক্ষেত্রেও তারা হয়ে উঠেছিল অনেক আধুনিক। ফ্রেমগুলি তৈরি হতো লোহা বা ব্রোঞ্জ দিয়ে। সেই চশমা এতটাই দামি হত যে একমাত্র ধনী লোকেরাই পড়তে পারত। চশমা ছিল সেসময় প্রয়োজনের বস্তু। চোখ খারাপ হলেই কেবল মানুষ পড়ত। অন্যদিকে গ্ল্যামার ও সৌন্দর্যের প্রধান শত্রু ছিল চশমা।

অভিজাত পরিবারে যাঁরা চশমা পরতেন, বিশেষত পুরুষেরা তাঁরা চশমা তৈরি করার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতেন। স্পেনে যেমন বড় বড় ফ্রেমই ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। নাকের উপর আরাম করে বসানোর জন্য ইউরোপের অনেক জায়গার চামড়ার দুটো চাকতি দেওয়া হত। সোনা বা রুপোর ফ্রেম ছিল অভিজাতদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। আঠেরো শতকে তৈরি হল ন্যুরেমবার্গ চশমা। স্প্রিং দেওয়া এই চশমা বসিয়ে দেওয়া হত নাকের উপর। এমন মানুষ ছিলেন না যাঁরা এটি ব্যবহার করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই চশমা ব্যবহার করেছিলেন। আঠেরো শতকের শেষের দিকে একটি কাচের চশমা নির্মাণ হল যা মোনোকল নামে পরিচিত ছিল। পরার পর মানুষটির চেহারাই পালটে যেত।

চোখের সমস্যা অর্থাৎ খালি চোখে দূরের ও কাছের দৃশ্য দেখতে না পাওয়ার ক্ষেত্রে চশমা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক অনুষঙ্গ। ধারণা করা হয়, ১২৮৬ সালে আলেসান্দ্রো দেল্লা স্পিনা নামের এক ইতালীয় ব্যক্তি প্রথম চশমা আবিষ্কার করেন। শুধু আবিষ্কারই নয়, স্পিনাই প্রথম মানুষের ব্যবহার উপযোগী চশমা তৈরি করেন। স্পিনার আবিষ্কৃত চশমাই ১৩০১ সালে ভেনিস সরকার বিক্রয়ের নীতিমালার আওতায় আনে। তবে পৃথিবী বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলোর লেখায় ১৩ শতকে চিনে চশমা ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর ১৩৫২ সালে তোমাসো দ্য মোদেনা নামের এক ইতালীয় চিত্রশিল্পী প্রথম চশমার ছবি আঁকেন। মোদেনা মূলত একজন উচ্চপদস্থ লোকের পড়ার ছবি এঁকেছিলেন যেখানে লোকটির চোখে চশমা ছিল। সেই হিসাবে চশমার আবিষ্কার ও ব্যবহারের ইতিহাসটা বেশ পুরনোই। তবে মজার ব্যাপার হল চশমা আবিষ্কৃত হলেও এটি কীভাবে কাজ করে সেই ব্যাখ্যা তখনও মানুষ ঠিক উদ্ধার করতে পারেনি। ১৬০৪ সালে চশমা কীভাবে কাজ করে তার প্রথম ব্যাখ্যা দেন জোহান্স কেপলার। চশমার মধ্যে দুটি ধরন আছে, এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাইফোকাল, যার আবিষ্কারক বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন এবং অন্যটি ইউনিফোকাল। বাইফোকাল চশমায় একটি লেন্সে দুটি ভিন্ন ধরনের পাওয়ার থাকে আর ইউনিফোকাল চশমায় একটি লেন্সে একধরনের পাওয়ার থাকে। কাছের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখার ক্ষেত্রে সাধারণত বাইফোকাল চশমা এবং দূরের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখার ক্ষেত্রে ইউনিফোকাল চশমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটি ফ্রেমের সাহায্যে চশমার লেন্সগুলো ব্যবহার করা হয়।

চশমার বিবর্তন কিন্তু সহজে হয়নি। বহুদিন মানুষ দেখতে ভালো নয় কেজো চশমা দিয়েই দিন চালিয়েছেন। ময়ের চাকা অনেক কিছুই পালটে দেয়। তাই এখন বিবর্তনের ফলে চশমা আধুনিক ফ্যাশন স্টেটমেন্টেও জায়গা করে নিয়েছে। চশমা এখন আর শুধু রাশভারী দাদুর সম্পত্তি নয়। চশমা সকলের।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০১৭

তোমাদের প্রিয় ‘উত্তরণ’-এ **‘আমার স্কুল’** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো ‘CONTENT FOR AAMAR SCHOOL’

মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ**

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ইতিহাস

পাল ও সেন যুগের অর্থনীতি

পাল-সেন যুগে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। অবশ্য এই যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব কমে এসেছিল। ভারতের পশ্চিমদিকের সমুদ্রে আরব বণিকদের দাপটের ফলে বাংলার বণিকরা পিছু হটেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার বণিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার যোগ ছিল। এই যুগে সোনা-রুপোর মুদ্রার ব্যবহার কমে কড়িই হয়ে উঠেছিল জিনিস কেনাবেচার প্রধান মাধ্যম।

পাল যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজারা ভূমিদান করতেন। সেন যুগে অনেক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে। সে আমলের লেখাগুলি থেকে জানা যায় যে, জমি কেনা-বেচার সময় কৃষককেও তার খবর দিতে হতো। সুতরাং, সমাজে কৃষককে নিতান্ত অবহেলা করা হত না। তবে জমিতে মূল অধিকার ছিল রাষ্ট্র বা রাজার। রাজারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তাঁরা নিজেদের ভোগের জন্য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করতেন। এই তিন ধরনের কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর ছিল। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের উপরেও কর দিতে হত গ্রামবাসীদের। এছাড়াও হাট এবং খেয়াঘাটের উপরেও কর চাপানো হতো।

এই যুগের প্রধান ফসলগুলি ছিল ধান, সরষে এবং নানারকমের ফল, যেমন আম, কাঁঠাল, কলা, খেজুর, নারকেল ইত্যাদি। আজ বাঙালির খাদ্যতালিকায় ডাল একটি প্রধান উপাদান। অথচ, সে যুগের শস্যের মধ্যে ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না কোথাও। এছাড়া কার্পাস বা তুলো, পান, সুপুরি, এলাচ, মহুয়া ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গ্রামের আশেপাশে ঘন বাঁশবাগান এবং নানারকম গাছের কথা জানা যায়। সেগুলির কাঠ ছিল এ যুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ। নদীমাতৃক বাংলার আরেকটি বড় সম্পদ ছিল মাছ। গৃহপালিত এবং বন্যপ্রাণীর মধ্যে ছিল গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, পায়রা, নানান জলচর পাখি, ঘোড়া, উট, হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, বানর, হরিণ, শূকর, সাপ ইত্যাদি।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র ছিল প্রধান সামগ্রী। বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড়ের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। হস্তশিল্পের মধ্যে কাঠ এবং ধাতুর তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস, গয়নার কথা জানা যায়। ঘর-বাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হতো।

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি:

পালযুগ বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময়কাল। আনুমানিক ৮০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার গৌড়-বঙ্গীয় রূপ থেকে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। সেটাই ছিল সাধারণ, নিরক্ষর লোকের ভাষা। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হতো। ওই ভাষা শিক্ষিত, পণ্ডিত এবং সমাজের উঁচুতলার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন, সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত কাব্য’ বা চক্রপাণি দত্তের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইগুলো সংস্কৃত ভাষাতে লেখা।

পাল রাজারা কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সম্ভবত ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তবে শশাঙ্কের আমলের বৌদ্ধধর্মের থেকে পালযুগের বৌদ্ধধর্ম অনেকটা আলাদা ছিল। পাল যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম অনেকটা আলাদা ছিল। পাল যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা মিলে গিয়ে বজ্রযান বা তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের জন্ম হয়েছিল। এই মতের নেতাদের বলা হতো সিদ্ধাচার্য। এছাড়া সহজযান ও কালচক্রযান নামে আরও দু’রকমের বৌদ্ধ ধর্মমতের এ সময় জন্ম হয়।

এই ধর্মীয় ভাবনায় না ছিল দেবদেবীর স্বীকৃতি, না মন্ত্র, পুজো, আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব। এই মতে বিশ্বাসীরা গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে গভীর যোগাযোগে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন, জ্ঞান মানুষের ভিতরেই থাকে এবং কোনও শাস্ত্রের বই পড়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিষ্কার মন এবং আত্মার উপর খুব জোর দেওয়া হত। তাঁরা বলতেন, আত্মা শুদ্ধ হলে তবেই মানুষ নির্বাণ বা চিরমুক্তি লাভ করতে পারে। ব্রাহ্মণ গোঁড়ামির বাইরে এই মতবাদগুলিতে উদার ধর্মীয় পথের খোঁজ পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া সিদ্ধাচার্যরা, যেমন লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ প্রমুখ তাঁদের মত প্রচার করতেন স্থানীয় ভাষায়। পাল যুগের শেষদিকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই ভাষায় চর্যাপদ লেখা শুরু করেছিলেন। চর্যাপদের মধ্য দিয়ে তখনকার বাংলার পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। এভাবে তাঁদের হাত ধরেই আদি বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিল।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভূগোল

মেঘেদের কথা

আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মেঘ আর বৃষ্টি। আকাশে জল জমে আর একসময় আকাশ ভেঙে মাটিতে সেই জল আছড়ে পড়ে। এই জমে থাকা জল যেন মেঘ আর আছড়ে পড়া জল বৃষ্টি। এই মেঘ-বৃষ্টি কীভাবে সৃষ্টি হয় আর তাদের প্রকারভেদ নিয়ে আজ আলোচনা করা হবে। মনে রেখো এদের কারণেই পৃথিবীতে জলের ভারসাম্য বজায় থাকে।

মেঘ: পৃথিবীপৃষ্ঠে যে জল নদী, পুকুর, সাগর ইত্যাদিতে জমে থাকে তা সূর্যের তাপে দিনেরবেলায় উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পাকারে বায়ুতে মেশে। জলীয় বাষ্পযুক্ত বাতাস সাধারণ বাতাসের থেকে অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়ায় উপরে উঠতে থাকে। ফলে ক্রমশ তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয় ও ঘনীভূত হয়। বাতাস যত ঠান্ডা হয় তার জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা তত কমতে থাকে। যখন ওই আর্দ্র বাতাসের তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কে এসে পৌঁছয় তখন তা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই বাতাস আরও ঠান্ডা হলে বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়ে বাতাসের ধুলো, লবণ কণা বা অন্যান্য কঠিন কণাকে আশ্রয় করে ভেসে বেড়ায়। সাধারণত এই জলকণার ব্যাস হয় ০.০২ মিমি। অনেক জলকণা একজোট হয়ে মেঘ তৈরি করে। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারে সাধারণত মেঘ সৃষ্টি হয়।

মেঘেদের অবস্থানের উচ্চতা অনুসারে তাদের ভাগ করা হয়।

বেশি উচ্চতার মেঘ ২০,০০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় অবস্থান করে। এরা আবার তিন প্রকারের হয়।

সিরাস: এই মেঘ সাদা রঙের হয়। স্বচ্ছ প্রকৃতির এই মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি দেখা যায়। এরা দেখতে হালকা পালকের মতো। এরা সাধারণভাবে পরিষ্কার আবহাওয়ার নির্দেশ করে। তবে এরা যদি একসঙ্গে বন্ধনী সৃষ্টি করে তবে খারাপ আবহাওয়া নির্দেশ করে।

সিরোস্ট্র্যাটাস: এই মেঘ পাতলা সাদা চাদরের মতো হয়। তাই আকাশ দুধে ঢাকা মনে হয়। অনেক সময় এই মেঘ সূর্য বা চাঁদের চারপাশে বলয়ের মতো অবস্থান করে।

সিরোকিউমুলাস: এই মেঘ পেঁজা তুলোর মতো। তাই এই মেঘে ঢাকা আকাশ ম্যাকারেল মাছের পিঠের মতো। এই মেঘও সাধারণত পরিষ্কার আবহাওয়াকে নির্দেশ করে।

এরপর আসে মাঝারি উচ্চতার কিছু মেঘ। এদের গড় উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট থেকে ২০,০০০ ফুট।

অল্টোস্ট্র্যাটাস: এই মেঘের রং নীল থেকে ধূসর। দেখতে অনেকটা তন্তুর মতো। এর মধ্যে দিয়ে সূর্যকে অনেকটা অনুজ্জ্বল দেখায়। এই মেঘ একটানা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়।

অল্টোকিউমুলাস: চ্যাপটা, গোলাকার, সাদা থেকে ধূসর এই মেঘ আকাশে ঢেউয়ের মতো অবস্থান করে।

এরপর নিম্ন উচ্চতার মেঘেদের গড় উচ্চতা সবথেকে বেশি ৬,৫০০ ফুট।

স্ট্র্যাটোকিউমুলাস: এই মেঘ অনেকটা স্তূপের মতো। এরা স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। এদের অনেক সময় দেখলে মনে হয় যে এরা যেন গড়িয়ে চলছে। তাই এর আরেকটি নাম Bumpy Cloud।

স্ট্র্যাটাস: এই মেঘ সাদা বা ধূসর হয় আর কুয়াশার মতো আকাশ ঢেকে রাখে। এই মেঘে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়। উঁচু পাহাড়ের গায়ে কুয়াশার মতো এই মেঘ বিমানচালক আর পর্বতারোহীদের দৃষ্টির অসুবিধা ঘটায়।

নিম্বোস্ট্র্যাটাস: এই মেঘ খারাপ আবহাওয়াকে নির্দেশ করে। এরা ঘন, পুরু, ধূসর থেকে কালো রঙের হয়। এই মেঘের কোনও নির্দিষ্ট আকার থাকে না। এই মেঘে একটানা বৃষ্টি হয়।

সবার শেষে উল্লম্ব মেঘের কথা বলতেই হয়। এদের গড় উচ্চতা ১,৬০০ ফুট। এদের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা উল্লম্বভাবে অবস্থান করে।

কিউমুলাস: এই মেঘ পুরু আর ঘন। এরা উল্লম্বভাবে অবস্থান করে। এর নীচের অংশ সমতল হলেও উপরিভাগ ফুলকপির মতো। এর শীর্ষদেশ বেশ উঁচু আর সাদা। কিন্তু এর নিম্নদেশ কালো হয়। এই মেঘে সাধারণত পরিষ্কার আবহাওয়ার পূর্বাভাস থাকে।

কিউমুলোনিম্বাস: এই মেঘের আকৃতি অনেকটা গম্বুজের মতো। এর রং সাদা বা ধূসর হয়। এই মেঘের বিস্তার ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২,০০০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এর ওপরের দিক চ্যাপটা আর সমতল হয়। এই মেঘে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হয়। আর সঙ্গে ঝড়ও হয়। এই মেঘে শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। এই মেঘের আরেক নাম Thunder Cloud।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০১৭

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ইতিহাস

ফরাসি বিপ্লব

আমরা পড়ছিলাম ফরাসি বিপ্লবের কারণ। সেই সময় ফ্রান্সের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির বিচারকরা ছিল অভিজাত শ্রেণির। অভিজাতদের বিরুদ্ধে রাজা কোনও আইন রচনা করলেই আইনসভা তা খারিজ করে দিত। ফ্রান্সে এই সময় মোট ১৩টি প্রাদেশিক আইনসভা ছিল। এদের মধ্যে প্যারিসের পার্লামেন্ট ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। সুতরাং ফ্রান্সের রাজারা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করলেও বাস্তবে তাদের ক্ষমতা সীমিত ছিল।

ফ্রান্সের আইনবিধি ছিল জটিল, বিশৃঙ্খল, দুর্বোধ্য ও অবৈজ্ঞানিক। দেশের এক এক অঞ্চলে এক এক রকম আইন প্রচলিত ছিল। কোথাও জার্মান আবার কোথাও রোমান আইন। এই ভাবে ফ্রান্সে বিভিন্ন ধরনের মোট চারশো আইন প্রচলিত ছিল। ল্যাটিন ভাষায় রচিত হওয়ায় আইনগুলি ফরাসি জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। দেশের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল। আইনগুলি ছিল অতি নির্মম। সাধারণ অপরাধের জন্যও মৃত্যুদণ্ড ছিল স্বাভাবিক। বিচারব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত, জটিল ও ব্যয়বহুল। বিচারকরা অধিকাংশই ছিলেন অসৎ। এখানেও ছিল অভিজাতদের একচেটিয়া আধিপত্য। বিচারকরা তাদের পদগুলি সরকারের কাছ থেকে কিনে নিতেন। সরকার তাদের কোনও বেতন দিত না। জরিমানা থেকে প্রাপ্ত অর্থের সবটাই তাঁরা পেতেন। এজন্য জরিমানার পরিমাণ ছিল অত্যধিক। আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল না। বংশানুক্রমিক ভাবে নিযুক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকেরা ন্যায় বিচারের চেয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত থাকতেন। এইসময় রাজস্ব আদায়কারী ইনটেন্ডেন্টরা ছিল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো অর্থলোলুপ। তারা বহু বাড়তি কর আদায় করত।

এই সময় ফ্রান্সের প্রধান কর ছিল টেইলি বা সম্পত্তি কর, ক্যাপিটেশন বা উৎপাদন কর, ভিটিংয়েম বা আয়কর। কিন্তু যাজক ও অভিজাতরা যথাক্রমে ১/১০ অংশ ও ১/৫ অংশ ফ্রান্সের ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁরা টেইলি কর দিতেন না। যাজক সম্প্রদায় পোইসির চুক্তি অনুযায়ী স্বেচ্ছায় কর দিত। রাজা তাঁদের উপর নির্দিষ্ট ও সমান হারে কর বসাতে পারতেন না। এদিকে অভিজাতরাও নানাভাবে ক্যাপিটেশন এবং ভিটিংয়েম বা আয়কর এড়িয়ে যেত। এর ফলে তিনটি প্রধান প্রত্যক্ষ করের বোঝা পড়ত তৃতীয় শ্রেণির ঘাড়ে। এছাড়াও ফ্রান্সের পরোক্ষ কর ছিল। গ্যাবেলা বা লবণ কর, তৃতীয় শ্রেণি সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিত। তারা গির্জাকে টাইদ অর্থাৎ ফসলের ১/১০ ভাগ কর দিত। সামন্তপ্রভুদের জন্য কর্ভি বা বিনা মজুরিতে কাজ করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। সরকার, গির্জা ও সামন্তপ্রভুদের কর মিটিয়ে তৃতীয় শ্রেণি বিশেষত কৃষকদের হাতে আর বিশেষ কিছু থাকত না।

উপরিউক্ত করগুলি ছাড়াও মদ,তামাক প্রভৃতির উপর ধার্য কর তৃতীয় শ্রেণিকে প্রদান করতে হত। এই অন্যায় ও অযৌক্তিক কর আদায়ে প্রচণ্ড কঠোরতা অবলম্বন করা হত। সরকারের অভ্যন্তরীণ শুল্ক নীতি ও শিল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মাল চলাচল ও অবাধ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক ছিল। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা নানাভাবে অর্থ আত্মসাৎ করত ও বণিকদের উপর অত্যাচার চালাত। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটত। রাজকোষেও অর্থ জমা পড়া বন্ধ হয়ে যেত। ফ্রান্সের অর্থনীতির অপর অন্ধকারময় দিক ছিল সরকারি অপব্যয় এবং রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা। সরকারের রাজস্ব খাতে যা আয় হত কর্মচারীদের বেতন, যুদ্ধের খরচ ও রাজপরিবারের ব্যয় মেটানো সম্ভব হত না।

এছাড়াও ফ্রান্সের সমাজে শ্রেণি বৈষম্য ছিল প্রবল। প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত অভিজাতরা ছিল বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত এবং বাকি মোট জনসংখ্যার ৯৭ ভাগেরও বেশি মানুষ অর্থাৎ বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক, সাঁকুলে, আইনজীবী, শিক্ষক সকলেই ছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এই তৃতীয় সম্প্রদায় ছিল সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণি। যাজক শ্রেণি উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজক এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ যাজকেরা ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। তাঁরা ছিল আইনের ঊর্ধ্বে। তাঁরা বিশেষ রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় অধিকার ভোগ করত। শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। নিম্ন যাজকরা ছিল নিষ্ঠাবান ও দরিদ্র। গির্জার আয়ের সিংহভাগ বিশপরাই পেত। এজন্য নিম্ন যাজকদের আর্থিক দুরবস্থায় দিন কাটাতে হত। তাই উচ্চ যাজকদের প্রতি নিম্ন যাজকরা প্রবল ঘৃণা পোষণ করত। ফরাসি বিপ্লবের সময় নিম্ন যাজকরা পুরাতন তন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

সমাজের দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন অভিজাতরা। ফ্রান্সের কৃষিজমির পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছিল তাঁদের অধিকারে। এজন্য তাঁরা সরকারকে কোনও ভূমিকর দিতেন না। বরং প্রজাদের কাছ থেকে নানা সামন্তকর আদায় করতেন। তাঁরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণি। তাঁরা নিজের সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রক্ষার জন্য সবসময় যত্নবান ছিলেন। অভিজাতরা দাবি করতেন যে, মধ্যযুগে যে সমস্ত ফ্রাঙ্কিস বিজেতা ফ্রান্স অধিকার করে, অভিজাত শ্রেণি ছিল এই বিজেতাদেরই বংশধর। এই অভিজাত শ্রেণি আড়ম্বরময় জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। অভিজাত শ্রেণি তাঁদের জমিদারিতে নানা প্রকার সামন্ত স্বত্ব ভোগ করতেন।

ফ্রান্সের তৃতীয় সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর, সাঁকুলে প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণিকে অধিকারহীন শ্রেণি বলা হত। তৃতীয় শ্রেণির মুখপাত্র ছিল বুর্জোয়া শ্রেণি। বুর্জোয়াদের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও তাদের বংশ কৌলীন্য ছিল না। এদের একটি অংশ চাকরি, আইনজীবী ও চিকিৎসকের পেশা নিয়েছিল। বুর্জোয়াদের অপর অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও তাঁরা অভিজাতদের সমান মর্যাদা পেত না, তাই এই বুর্জোয়া শ্রেণি অভিজাত শ্রেণির সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত।

তৃতীয় শ্রেণির একটি বড় অংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। এঁদের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রে নানাভাবে নিপীড়িত হতেন। তাদের মধ্যে নানা শ্রেণিবিভাগ ছিল। স্বাধীন কৃষক, ভাগচাষি, খাজনা চাষি, খেতমজুর এবং সবার নীচে ছিলেন অসংখ্য ভূমিদাস। রাষ্ট্র, সামন্তপ্রভু ও গির্জাকে তাঁরা নানা ধরনের কর দিতে বাধ্য ছিল। তাঁরা রাষ্ট্রকে টেইলি, ক্যাপিটেশন, ভিটিংয়েম, গ্যাবেলা, কর্ভি, টাইদ প্রভৃতি কর দিতে বাধ্য ছিলেন। বিপ্লব শুরু হলে করভারে জর্জরিত কৃষকরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভূগোল

মরুভূমি

আগের টিউশনে বায়ুর কাজ এবং প্রভাবের জন্য মরুভূমিতে যে নানারকম ভূমিরূপ তৈরি হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল।

মরুভূমিতে আরও কিছু ভূমিরূপ দেখা যায় যারা বাতাসের সঙ্গে জলের কাজের ফলে তৈরি হয়। আজ সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। এরপরে মরুকরণ আর তার প্রতিরোধ নিয়ে কিছু কথা বাকি থেকে যায় সেগুলো আলোচনা হবে।

প্রথমে আমরা মরুভূমিতে জল আর বাতাসের মিলিত শক্তির ফলে যে যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তাদের নাম আর বৈশিষ্ট্যগুলো জানব। মরুভূমিতে জলের শক্তি বা কাজের কথা শুনে তোমরা অবাক হবে কারণ, মরুভূমি তো তৈরিই হয় জলের অভাবে। আসলে মরুভূমির সব অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিমুক্ত নয়। আবার সব মরুভূমিতে বৃষ্টিও হয় না। এমনও হয় যে হঠাৎ করে মরুভূমিতে কোনও কোনও জায়গায় অল্প সময়ের জন্য প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে যায়। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০-৬০ সেমি ও হতে পারে। এই ধরনের হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিতে ছোট ছোট জলধারা তৈরি হয়। এই জলধারা আর বায়ু আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে নানারকম ভূমিরূপ সৃষ্টি করে।

পেডিমেন্ট: 'পেডি' (pedi)-র অর্থ পাদদেশ। আর 'মেন্ট' শব্দটি এসেছে mont শব্দ থেকে। এর মানে পাহাড়। পেডিমেন্ট বলতে পর্বতের পাদদেশীয় সমতলভূমিকে বোঝায়। পর্বতের নীচে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে প্রায় সমতলভূমি সৃষ্টি হয়। এর ওপর হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে বালি, নুড়ি, শিলাচূর্ণ, কাঁকর ইত্যাদি জমা হয়ে যে সমতলভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে পেডিমেন্ট বলে। সাহারা মরুভূমিতে পেডিমেন্ট দেখা যায়।

বাজাদা: মরুভূমি অঞ্চলে পেডিমেন্ট তৈরি হলে তার নীচে অবনত অঞ্চলে একই কারণে নুড়ি, বালি, কাঁকর, কাদা ইত্যাদি দিনে দিনে স্তরে স্তরে জমা হয়ে সমভূমি তৈরি করলে তাকে বাজাদা বলে।

প্লায়া: মরুভূমিতে হঠাৎ বৃষ্টি হলে সেই জল যদি পেডিমেন্ট আর বাজাদা ছাড়িয়ে আরও নিম্নভূমিতে গিয়ে কোথাও জমে হ্রদের সৃষ্টি করে তবে তাকে প্লায়া বলে। এদের স্যালিনাও বলে। সাধারণত বৃষ্টির জলের সঙ্গে মরুভূমির লবণ ধুয়ে আসে। তাই জল নোনা হয়। মেক্সিকোতে এই প্লায়া-র নাম 'বোলসন', আফ্রিকায় 'শটস', আর রাজস্থানে 'রাণ'।

ওয়াদি: হঠাৎ বৃষ্টির ফলে মরুভূমিতে জলধারা সৃষ্টি হয়ে নদীখাতের সৃষ্টি করে। বৃষ্টির সময় এই সব নদীখাতে জল থাকে। বছরের বাকি সময় এরা শুকনো অবস্থায় থাকে। মরুভূমিতে এরকম শুষ্ক নদীখাত ওয়াদি নামে পরিচিত।

এবার আমরা মরুকরণ সম্পর্কে জানব।

নানা কারণে মরুভূমি ক্রমশ বিস্তারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে মরুকরণ বলে। এর মধ্যে বেশিরভাগটাই মানুষের নানা রকম কাজকর্মের ফলে হয়। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ২০% অংশ মরুকরণের অন্তর্গত। যেখানে প্রায় ১০০টি দেশ এবং ১০ কোটি মানুষ মরুকরণের ফলে দৈনন্দিন জীবনে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ বর্গকিমি অঞ্চল মরুভূমির অন্তর্গত হচ্ছে।

প্রথমে আমরা এর কারণগুলি সম্পর্কে জানব।

অরণ্যের ধ্বংস: ব্যাপক হারে গাছ কাটার ফলে মরুভূমির সম্প্রসারণ হয়। গাছের উপস্থিতিতে তার আশেপাশের অঞ্চলে জলবায়ুর যে স্থায়িত্ব আসে বা বৃষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকে, তা নষ্ট হয়।

অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ: মরুভূমিতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ হলে তা মরুকরণের সম্ভাবনাকে বাড়ায়।

অতিরিক্ত পশুচারণ: তৃণভূমিসহ অন্যান্য গাছপালা অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে বারবার পর্ণমোচন সহ্য করতে পারে না। ফলে তারা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পেয়ে মরুকরণ হয়।

ভৌমজলের অতিশোষণ: সেচের প্রয়োজনে ভৌমজল ও ভূপৃষ্ঠের জলের অতিরিক্ত ব্যবহারে জলের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শুষ্কভূমি তৈরি হচ্ছে। আবার কোথাও অতিরিক্ত লবণাক্ত জল জমে মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে।

অতিরিক্ত খননকার্য: অতিরিক্ত খননে গাছপালা, মাটি অপসারিত হয়। ফলে প্রাকৃতিক উপাদান নষ্ট হয়ে মরুকরণ হয়।

অলাভজনক ভূমি ব্যবহার: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মরুভূমিতে অতিরিক্ত জমি, পতিত জমি, প্রান্তিক ভূমি ও বালিয়াড়িকেও চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মাটির বাঁধন আলগা হয়ে যায়। তখন বাতাসের সঙ্গে বালুরাশি উড়ে উর্বর জমিতে পড়ে বালির পাহাড় তৈরি করে।

আলোচিত বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ মরুকরণ আটকাতে পারে। যেমন, আফ্রিকার সাহারা আর ভারতের থর-এর সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য ইউক্যালিপটাস, অ্যাকাশিয়া ইত্যাদি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন গাছ লাগানো হয়েছে। জনবসতিযুক্ত অঞ্চলে গাছের পরিমাণ বাড়ানো, নানা পদ্ধতির মাধ্যমে চলমান বালিয়াড়িগুলিকে বাধাদান, দীর্ঘ শিকড়যুক্ত ঘাস আর বৃক্ষরোপণ করে আলগা বালিকে সংবদ্ধ করার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন যেমন থরে সেন্ট্রাল এরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট গঠিত হয়েছে যারা বিষয়টির তত্ত্বাবধান করছে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০১৭

মৃত্যুর প্রহর গুনছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ

মৃত্যু নামক শব্দটা শুনলেই বুকের ভেতর একটা অজানা শূন্যতা বিরাজ করে। আর সেই মৃত্যুটা যে কারওরই হোক না কেন! হতে পারে সেটা কোনও জীবন কিংবা সৌন্দর্যের মৃত্যু!

অত্যন্ত অদ্ভুত হলেও সত্যি যে, বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের মৃত্যু ঘটতে চলেছে! অনেকদিন ধরেই পরিবেশবিদরা দাবি করে আসছেন, অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল ঘেঁষে থাকা গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ বা বৃহৎ প্রবাল প্রাচীর মৃত্যুর দিন গুনছে। কিন্তু মেরিন পার্কের কর্মকর্তাদের একটি সিদ্ধান্তে এর মৃত্যুর সময় হয়তো আরও একধাপ এগিয়ে এল।

গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রবাল প্রাচীর। মহাকাশ থেকে দেখতে পাওয়া পৃথিবীর কয়েকটি জিনিসের মধ্যে এটি অন্যতম। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কুইন্সল্যান্ডের সমুদ্র তীরবর্তী প্রবাল সাগরে অবস্থিত এই গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অসংখ্য জীবন্ত প্রাণী একত্র হয়ে বিশাল এই প্রবাল প্রাচীর গঠিত হয়েছে। যা পৃথিবীর সবচেয়ে বিচিত্র বাস্তুতন্ত্রের একটি এবং অস্ট্রেলিয়ার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবে কীভাবে এটি গড়ে উঠেছে সে রহস্য আজও অজানা। গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ প্রায় ৯০০টি ছোট-বড় দ্বীপ এবং তিন হাজারেরও বেশি প্রবাল প্রাচীর নিয়ে গঠিত, যেটি প্রায় ৩,৪৪,৪০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত। প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রবাল প্রাচীর পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ ইউনেস্কোর ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের অংশ। একে 'স্বচ্ছ ও উদার সামুদ্রিক অতিবিরল রাজ্য' গণ্য করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে অবস্থিত গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ শুধু বিশ্বের বিখ্যাত পর্যটন স্থানই নয়, বরং এটি একটি বৈজ্ঞানিক নিদর্শন। পৃথিবীর সবচেয়ে বিচিত্র এই গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের বয়স প্রায় দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর। পরিবেশবিদদের ধারণা, প্রাচীন এই বাস্তুতন্ত্রে প্রায় ১ হাজার ৬২৫ প্রজাতির মাছ বসবাস করত। পাশাপাশি তিন হাজার প্রজাতির শামুক এবং ত্রিশটি বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন-সহ প্রবাল এখানে বিদ্যমান রয়েছে। পর্যটকদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র। এর মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি যেমন সমৃদ্ধ তেমনই প্রতি বছর প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার এই রিফের থেকে আয় করছে দেশটির সরকার। প্রতিবছর সারা পৃথিবী থেকে কুড়ি লক্ষেরও বেশি পর্যটকের আগমন ঘটে এখানে।

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট সংকটে, সেখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙে পড়েছে। তবে পরিবেশগত কারণ যতটা না দায়ী, মানবসৃষ্ট কারণ তার চেয়ে বহুগুণে দায়ী। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে ত্রিশ লক্ষ কিউবিক মিটার পলি মাটি ফেলার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে মেরিন পার্কটির কর্তৃপক্ষ। বিশ্বের অন্যতম বড় কয়লা বন্দর তৈরির লক্ষ্যে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছেন পরিবেশবাদীরা। কারণ, পলি মাটি ফেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্ব ঐতিহ্য এই গ্রেট ব্যারিয়ারের বাস্তু সংস্থান।

২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকার উত্তর কুইন্সল্যান্ডের অ্যাবেট পয়েন্টের কয়লা বন্দরটি বিস্তৃত করার পরিকল্পনায় অনুমোদন দেয়। কয়লা রফতানির জন্য বেশ কয়েকটি কোম্পানি অ্যাবট পয়েন্ট ব্যবহার করতে চাইছে। মূলত, জাহাজ চলাচলের পথ সুগম করার জন্য পলিমাটি ফেলার সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ বলছে, এই পলিমাটি প্রবাল প্রাচীরটির কোনও ক্ষতি করবে না। পার্কের কর্তৃপক্ষ রাসেল রেইচেল্ট এই সিদ্ধান্তের পক্ষে বলেন, 'অ্যাবট পয়েন্টে ফেলা উপাদানে ৭০ শতাংশ বালি, ৩০ শতাংশ পলি মাটি ও কাদা। কোনও বিষাক্ত পদার্থ নেই। ভবিষ্যতেও কোনও অবস্থাতেই আমরা বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করব না।'

কিছুদিন আগেই অস্ট্রেলিয়া সরকার বলেছে, ইউনেস্কোর তথ্যে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফকে রক্ষার ক্ষেত্রে তারা চমৎকার অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ তীরবর্তী অঞ্চলের খনি শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। খনি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ নিকটবর্তী অঞ্চলে পোতাশ্রয় নির্মাণ করে, বর্জ্য নিষ্কাশন করে, সমুদ্রপথ সূচনা করে। ফলে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের প্রাকৃতিক পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

গত বছরই জানুয়ারির গোড়ার দিকে সারা বিশ্ব থেকে ২৩৩ জন বৈজ্ঞানিক একটি লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে প্রকল্পটি বর্জন করার আবেদন জানান। গ্রিনপিসের তরফ থেকে লুইস ম্যাথিসন বলেন, সিদ্ধান্তটি কার্যকর হলে অস্ট্রেলিয়ার সামুদ্রিক জীবজন্তু, মৎস্য ও পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অপরদিকে, আবহাওয়ার ঘনঘন পরিবর্তন, জমি দূষণ, সমুদ্রের জলের অম্লতা বৃদ্ধি এবং প্রবালভোজী ক্রাউন অফ থর্নস স্টারফিশের বংশবৃদ্ধির ফলে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল জুড়ে ২৬০০ কিলোমিটার ব্যারিয়ার রিফ এমনিতেই বিপন্ন। অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেরিন সাইন্স বা এইমসের গ্লেন ডাথ ও তাঁর সহযোগীরা জানান, ১৯৮৫ সালে থেকে এখনও পর্যন্ত ওই এলাকায় হওয়া ৩৪টি ঘূর্ণিঝড় প্রায় ৪৮ শতাংশ প্রবাল ক্ষয়ের জন্য দায়ী। ৪২ শতাংশ প্রবাল বিলুপ্তির জন্য দায়ী প্রবালখেকো স্টারফিশ। এছাড়া, জলবায়ু জনিত রাসায়নিক পরিবর্তন আরও দশ শতাংশ প্রবাল ক্ষয়ের জন্য দায়ী বলে জানান গবেষকরা।

অর্থাৎ, শিল্প উন্নয়নে মানুষের আগ্রাসন এবং পরিবেশগত বিপর্যয় গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের জন্য মৃত্যুর গালিচা তৈরি করে দিয়েছে। আর এই কারণে গত ত্রিশ বছরে প্রায় অর্ধেক প্রবাল প্রাচীর বিলীন হয়ে গেছে। কোনও কোনও বিজ্ঞানী পূর্বাভাস দিয়েছেন, কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আগামী ২০২২ সালের পর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আর দেখা যাবে না।

অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ান গবেষকরা জানান, একধরনের গোপন ভাইরাসের আক্রমণে হুমকির মুখে পড়েছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের অস্তিত্ব। দ্বীপের প্রয়োজনীয় প্রবালগুলো 'সিমবায়োডিনিয়াম' নামে পরিচিত 'ফটোসিনথেটিক' ধরনের শ্যাওলার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে। ফটোসিনথেটিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গাছেরা সূর্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে। গবেষকরা উল্লেখ করেন, এককোষী সিমবায়োডিনিয়াম এবং প্রবালের এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের প্রবালগুলো। কিন্তু বর্তমানে ওই গোপন ভাইরাসের আক্রমণে এই সম্পর্ক ভেঙে পড়ছে। ফলে সংকটের মুখে পড়েছে বিশ্বের ঐতিহ্য গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ। মৃত্যুর প্রহর গুনছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৪ জুলাই ২০১৭

ক্যুইজ

১) ইরাকের আগের নাম কী ছিল?
২) প্লবতা সবসময় কোন দিকে ক্রিয়া করে?
৩) সিনেমা হলের দেওয়ালে রবারের প্যাড লাগানো থাকে কেন?
৪) মালনাদ কথাটির অর্থ কী?
৫) গমন করতে পারে না এমন একটি প্রাণী কী?
৬) অচল সন্ধি কোথায় দেখা যায়?
৭) মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অস্থির নাম কী?
৮) কোন পেশি দেহের কোনও অংশকে ঘোরাতে সাহায্য করে?
৯) পাখির লেজের পালকের নাম কী?
১০) ক্যারিওকাইনেসিস কী?
১১) মিশ্র চাষ কোথায় হয়?
১২) হিমালয়ের উৎপত্তি কোন যুগে হয়?
১৩) পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সারাবছর শীতকাল?
১৪) বংশগতির প্রাথমিক উপাদান কী?
১৫) জীবের বহিরাকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে কী বলে?
১৬) পাখির দেহে তৈলগ্রন্থি কোথায় থাকে?
১৭) পডসল মৃত্তিকা কীভাবে তৈরি হয়?
১৮) কাকড়াপাড়া প্রকল্প কোন নদীর ওপর অবস্থিত?
১৯) মাথেরন শৈলশহর কোথায় অবস্থিত?
২০) অকালি আন্দোলন কোথায় শুরু হয়েছিল?
২১) কোন উভচর প্রাণী উড়তে পারে?
২২) কোন খনিজ পদার্থের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়?
২৩) নর্মদা ও তাপ্তী নদীর মাঝে কোন পর্বত আছে?
২৪) পরিবেশের সঙ্গে জীবের খাপ খাওয়ানোর ধর্মকে কী বলে?
২৫) কোষের কোন অংশ ক্রোমোজোম দিয়ে গঠিত?
২৬) আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় পৌষ্টিক গ্রন্থির নাম কী?
২৭) উদ্ভিদের পুষ্টি কী প্রকৃতির?
২৮) কোন শিলায় স্তর দেখতে পাওয়া যায় না?
২৯) তিস্তা নদীর উৎপত্তি কোথা থেকে?
৩০) সিমলা চুক্তি কোন ভাইসরয়ের আমলে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
৩১) কোন হরমোনকে সংকটকালীন হরমোন বলে?
৩২) ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বনভূমিতে কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না?
৩৩) অপ্রকৃত ফল কী কী?
৩৪) শেয়ালের লালায় কোন ভাইরাস থাকে?
৩৫) কোন হরমোন সুপ্ত বীজকে জাগিয়ে তোলে?
৩৬) আধুনিক মানুষের উৎপত্তি কোন যুগে?
৩৭) সাধারণ বর্ণান্ধ ব্যক্তিরা কোন কোন রং চিনতে পারেন না?

৩৮) ক্যানসার সৃষ্টকারী জিনকে কী বলে?
৩৯) কোন ধরনের কোষ বিভাজনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে?
৪০) কায়িক পরিশ্রমকারীদের কী জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ করা উচিত?

উত্তর: ১) মেসোপটেমিয়া। ২) অভিকর্ষের বিপরীতে। ৩) শব্দের অনুরণন কমানোর জন্য। ৪) পাহাড়ি দেশ। ৫) স্পঞ্জ। ৬) করোটিতে। ৭) মধ্য কর্ণের স্টেপিস। ৮) রোটেটর পেশি। ৯) রেক্ট্রিসেস। ১০) নিউক্লিউয়াসের বিভাজন। ১১) ইউরোপ। ১২) মিওসিন যুগে। ১৩) মেরু অঞ্চলে। ১৪) জার্মপ্লাজম। ১৫) ফেনোটাইপ। ১৬) পায়ু ছিদ্রের ওপরে। ১৭) সরলবর্গীয় গাছের পাতা পচে। ১৮) তাপ্তী। ১৯) মহারাষ্ট্রে। ২০) পঞ্জাবে। ২১) র‍্যাকোফোরাস। ২২) আয়োডিন। ২৩) সাতপুরা পর্বত। ২৪) অভিযোজন। ২৫) নিউক্লিয়াস জালিকা। ২৬) যকৃৎ। ২৭) স্বভোজী প্রকৃতির। ২৮) কংগ্লোমারেট। ২৯) জেমু হিমবাহ। ৩০) লর্ড ওয়েভেল। ৩১) অ্যাড্রিনালিন হরমোন। ৩২) শাল। ৩৩) আপেল, আনারস, কাঁঠাল। ৩৪) রেবিস। ৩৫) জিব্বেরেলিন। ৩৬) সিনোজোয়িক যুগে। ৩৭) লাল ও সবুজ। ৩৮) অঙ্কোজিন। ৩৯) মিয়োসিস। ৪০) প্রোটিন।

এডু অ্যাডভাইস

ভালো ফল করতে হলে সব পরীক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে

সারা বছরের পরিশ্রমের মূল্যায়ন পাওয়া যায় বছরের শেষে পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডে। সবাই তার অপেক্ষায় থাকে। যদিও শুধু তা দিয়ে লেখাপড়ায় কে কত এলেমদার তা প্রমাণ হয় না। তবে ফাইনাল পরীক্ষা যদি মাথাব্যথার কারণ হয় তবে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় হল সারা বছরে ওই পরীক্ষা নামক ঘটনাকে এতবার উপলব্ধি করা যে সব ভীতি দূর হয়ে যায়।

আসলে জীবনে একের পর এক অধ্যায় পার করার সময়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হবে। এই আমাদের সমাজব্যবস্থার নিয়ম। অনবরত যোগ্যতা প্রমাণ করে যাওয়া। এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাস। মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, জীবিকা এবং সেখানেও একের পর এক ধাপ পেরোনো। তাই সবথেকে ভালো পরীক্ষাকে একটু সইয়ে নেওয়া। আমাদের সমাজে পরীক্ষা ও তার ফলাফল নিয়ে অযৌক্তিক মাথাব্যথা আর উদ্বিগ্নতার মানসিকতা তৈরি হয়ে আছে। এর ওপরেই যেহেতু জাগতিক উন্নতি ও সাফল্যের বিষয়গুলো নির্ভর করে তাই এই পরীক্ষা বিষয়টিকে নিয়ে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাপানউতোর তৈরি হয়। আর তা পরীক্ষাকে ছাত্রজীবনেই শত্রুর রূপ দেয়। কিন্তু মুশকিল হল বিষয়টা এমন নয় যে, পরীক্ষা মানেই শুধু কোনও একজনের খামতি খুঁজে বার করা বরং কে কোন বিষয় কতটা জানে তা পরখ করাই তো উদ্দেশ্য। ভালো ফল করার আশায় বারেবারে খামতিগুলোকে নজরে এনে ছাত্রছাত্রীদের সাবধান করা হতে থাকে ফলে মনের মধ্যে বসে যায় যে পরীক্ষা মানেই নিজের ফাঁকফোঁকর অন্যের সামনে তুলে এনে হেনস্থা করা।

তাই প্রথমে পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো খুব দরকার। নিজেকে বুঝতে হবে যে, পরীক্ষা আসলে নিজেকে যাচাই করার একটা উপায়। সেটা সমানতালে করতে থাকলে মূল পরীক্ষায় নিজের ঘাটতি নিজেদের খুঁজে পেতেই নাজেহাল হতে হবে। তার মানেই ভালোভাবে পরীক্ষায় উতরে যাওয়া। তাই সবার প্রথমে পরীক্ষার প্রতি ভীতি, অনীহা, পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা বদলাতে হবে। তাতেই অর্ধেক কাজ হবে।

এমনিতে স্কুলগুলো এখন ক্লাসে সারপ্রাইজ টেস্ট, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা নিয়েই থাকে। যার যা নিয়মকানুন। তাছাড়া ক্লাসে পরীক্ষা, বাড়িতে নিজে দেওয়া পরীক্ষা তো আছেই। এই সবকিছুকেই খুব গুরুত্ব দিতে হবে। অনেকেই ভাবে, বাড়ির পরীক্ষা তো, দিলেই হল। কী আর এমন ব্যাপার! ফলে পরীক্ষা দেওয়ার সময় দায়সারা ভাব তৈরি হয়। যা হোক একটা কিছু করে দেওয়ার প্রবণতা কাজ করে। তাতে কোনও উদ্দেশ্য সফল হয় না। উলটে নিজের ফাঁকফোকরগুলো টের পাওয়ার উৎযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

ছোট ছোট পরীক্ষাগুলো যত্নের সঙ্গে বারে বারে দিলে পড়াটাও ছোট ছোট ভাগে তৈরি হয়ে যায়। বারে বারে লেখালেখির ফলে যত্ন করে লিখে পরীক্ষা দিতে কোনও আলাদা করে পরিশ্রম করতে হয় না। সুন্দর খাতা সহজাতভাবেই তৈরি হয়। সব পরীক্ষা যত্নের সঙ্গে দিলে সুবিধে এটাই যে, পরীক্ষার দিন খুব আলাদা কিছু করতে যাচ্ছি বলে মনে হয় না। একটা স্বাভাবিক আচরণ এমনিতেই তৈরি হয়। ফলে ভালো ফল আরও সহজ হয়ে যায়।

নিজের সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বেশ দরকার। যেটা এই ছোট ছোট পরীক্ষাগুলো থেকেই তৈরি হয়। নিজের লেখার গতি, অন্যমনস্কতার কারণে কী কী ধরনের ভুলভ্রান্তি হচ্ছে! পড়ার বিষয়ে বাস্তবিক ক্ষেত্রে কী কী মনে থাকছে, বা নিজের প্রকাশের ভঙ্গি ঠিক থাকছে কি না এসব একটা বিচার করার সুযোগ পাওয়া যায় পরীক্ষা থেকে। সময়ের মধ্যে উত্তর করতে পারা। নানারকম প্রশ্ন পড়ে তা ঠিকঠাক বোঝা হচ্ছে কি না তাও জানা যায়। তাই সব পরীক্ষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়াই জীবনের যে কোনও পরীক্ষা ভালোভাবে দেওয়ার চাবিকাঠি।

জেনে রাখতে পারো

অবাক পৃথিবী

পৃথিবীতে কত কিছু ঘটেছে আর ঘটছে। সবকিছুই সত্যি, কিন্তু যেহেতু সবকিছু আমরা দেখতে পাই না বা টের পাই না তাই সেসব শুনলে আমরা অবাক হই। ইতিহাসেও এমন কত তথ্য লুকিয়ে রয়ছে যা আমাদের অবাক করতে পারে। আমরা এসবের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করি। এসব তথ্য আমাদের চমকে দেয়। কিন্তু ইতিহাস, পরিসংখ্যান, বিজ্ঞান এসব আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আজ আমরা এরকমই কিছু তথ্য জানব।

গত সপ্তাহের পর

- মেরুপ্রদেশে বস্তুর ওজন ৩ শতাংশ কমে যায়।
- পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমাত্র কবি যিনি তিনটি দেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। বাংলাদেশ, ভারত এবং শ্রীলঙ্কা।
- একমাত্র ভারতবর্ষ একটি দেশ যার সংবিধানে গোরুর জন্যও আইন আছে।
- মহাকাশে কেউ স্বপ্ন দেখে না এবং কান্না করলে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে না। মাধ্যাকর্ষণ বলের অনুপস্থিতির কারণে।
- মানুষের মস্তিষ্ক পৃথিবীতে একমাত্র বস্তু যে নিজেই নিজের নামকরণ করেছে।
- রাশিয়ার ক্ষেত্রফল প্লুটোর ক্ষেত্রফলের চেয়ে বেশি।
- একমাত্র চিনের প্রাচীর মানুষের হাতে তৈরি কীর্তি যা চাঁদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়।
- নতুন কলম হাতে নিলে বেশিরভাগ মানুষ তার নিজের নাম লিখে থাকে।
- ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের আয়তন গ্রিকের দুই মহাকাব্য ইলিয়াড এবং ওডিসির চেয়ে প্রায় সাতগুণ বেশি।
- প্রতি ১৪ দিন অন্তর পৃথিবীতে একটি করে ভাষার মৃত্যু ঘটছে।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে জিরাফের রক্তচাপ বেশি।
- ম্যাডাম কুরি রেডিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর এই তেজস্ক্রিয়তার কারণেই তিনি ক্যানসারে মারা যান। তাঁর নোটবুক এখনও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়ায়।
- ফর্মুলা ওয়ানের চালকেরা প্রায় পাঁচগুণ বেশি মহাকর্ষ বল (5G) অনুভব করে তার ঘারে। তাদের ঘার ভেঙে যেত যদি না বিশেষ ভাবে তৈরি জ্যাকেট পরত।
- আমাদের মুখ থেকে পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তু পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় সাত সেকেন্ড।
- প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন ঠিক চাঁদের আয়তনের সমান।
- হাইতি নামক দেশে পৃথিবীর মধ্যে এইডস রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রতি ৫০ জনে একজন ব্যক্তি এইডসের শিকার।
- একমাত্র আইসল্যান্ড একটি দেশ যে তার সংবিধান পুনরায় রচনার জন্য Facebook ব্যবহার করছে।
- একসময় মিসিসিপি নদী ভূমিকম্পের ফলে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছিল যা এখনও বিদ্যমান।
- পৃথিবীর সব পিঁপড়ের ওজন পৃথিবীর সব মানুষের ওজনের চেয়ে বেশি।
- আমাদের মস্তিষ্ক মাত্র ১৫০টি দৃঢ় সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম।
- মিশরের পিরামিডের মধ্যে মমির পাশে রাখা তিন হাজার বছরের পুরনো মধু এখনও খাওয়ার যোগ্য আছে।
- নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে প্রথম তার বাঁ পা ফেলেছিলেন।
- হিরোসিমায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরও এক ব্যক্তি বেঁচে ছিলেন যিনি ১৯৫১ সালে বোস্টন অলিম্পিকের ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পুরস্কারও জিতেছিলেন।
- জাপানের স্বাক্ষরতার হার ১০০% এবং কিউবার ৯৯.৮%
- পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভ্রমণকারী যায় ফ্রান্সে। ২০১২ সালে ভ্রমণকারীর সংখ্যা ছিল আট কোটি ত্রিশ লক্ষ।
- পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ উসেইন বোল্ট যদি চাঁদে দৌড়ে যান তাহলে চাঁদে পৌঁছতে তাঁর সময় লাগবে এক বছর।
- একটি রুল পেনসিল দিয়ে প্রায় ৫০ হাজার শব্দ লেখা যাবে অথবা প্রায় ৩৫ মাইল দীর্ঘ রেখা আঁকা যাবে।

এরপর আগামী সপ্তাহে

ঘূর্ণিঝড়

সাধারণভাবে ঘূর্ণিঝড়কে সাইক্লোন বা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বলা হয়। সাইক্লোন বা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন দু'টি নামে পরিচিত। একটি হল হারিকেন এবং অপরটি টাইফুন। সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ কাইক্লোস থেকে, যার অর্থ বৃত্ত বা চাকা। এটা অনেক সময় সাপের বৃত্তাকার কুণ্ডলী বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। ১৮৪৮ সালে হেনরি পিডিংটন তাঁর 'সেইলরস হর্ন বুক ফর দ্য ল অব স্টর্মস' বইতে প্রথম সাইক্লোন শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর থেকেই ঘূর্ণিঝড় বোঝাতে সাইক্লোন শব্দের ব্যবহার শুরু হয়।

আটলান্টিক মহাসাগর এলাকা তথা আমেরিকার আশেপাশে ঘুর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ১১৭ কিলোমিটারের বেশি হয়, তখন জনগণকে এর ভয়াবহতা বোঝাতে হারিকেন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মায়া দেবতা হুরাকান— যাকে বলা হতো ঝড়ের দেবতা, তাঁর নাম থেকেই হারিকেন শব্দটি এসেছে। তেমনিভাবেই, প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা তথা চিন, জাপানের আশেপাশে হারিকেনের পরিবর্তে টাইফুন শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যা ধারণা করা হয় চিনা শব্দ টাই-ফেং থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রচণ্ড বাতাস। অনেকে অবশ্য মনে করেন ফার্সি বা আরবি শব্দ তুফান থেকেও টাইফুন শব্দটি আসতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় হল ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রে সৃষ্ট বৃষ্টি, ব্রজ ও প্রচণ্ড ঘূর্ণি বাতাস সংবলিত আবহাওয়ার একটি নিম্নচাপ প্রক্রিয়া, যা নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন তাপকে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে। এই ধরনের ঝড়ে বাতাস প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলে বলে এর নামকরণ হয়েছে ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের ঘড়ির কাঁটার দিকে হয়।

ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানলে যদিও দুর্যোগের সৃষ্টি হয়, কিন্তু এটি আবহাওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা পৃথিবীতে তাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। গড়ে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৮০টি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে। এর অধিকাংশই সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, কিন্তু যে অল্প সংখ্যক উপকূলে আঘাত হানে তা অনেক সময় ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করে।

সাতটি বেসিনেই বাতাসের গতিবেগ অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়কে কতগুলো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। আটলান্টিক এলাকার জন্য, প্রাথমিক অবস্থায় বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটারের নীচে থাকে, তখন একে শুধু নিম্নচাপ বলা হয়। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটারের বেশি হলে এটিকে একটি নাম দেওয়া হয় এবং ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার থেকে ১১৭ কিলোমিটার ব্যবধানে এটিকে একটি ঝড় বা ট্রপিক্যাল স্টর্ম বলা হয়। বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ১১৭ কিলোমিটারের বেশি হয়, তখন এটি হারিকেন পর্যায়ে উন্নীত হয়। বাতাসের তীব্রতা এবং ধ্বংসক্ষমতা অনুযায়ী হারিকেনকে আবার এক থেকে পাঁচ মাত্রার পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এটি আবিষ্কারকে নামানুসারে সাফির-সিম্পসন স্কেল নামে পরিচিত।

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য আনুষঙ্গিক কিছু প্রভাব কাজ করে। এগুলির মধ্যে রয়েছে—

সমুদ্রের তাপমাত্রা

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্রের তাপমাত্রা কমপক্ষে ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকা আবশ্যক এবং একটি নির্দিষ্ট গভীরতা (কমপক্ষে ৫০ মিটার) পর্যন্ত এই তাপমাত্রা থাকতে হয়। এজন্য আমরা দেখি সাধারণত কর্কট ও মকর ক্রান্তিরেখার কাছাকাছি সমুদ্রগুলিতে গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্মের শেষে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।

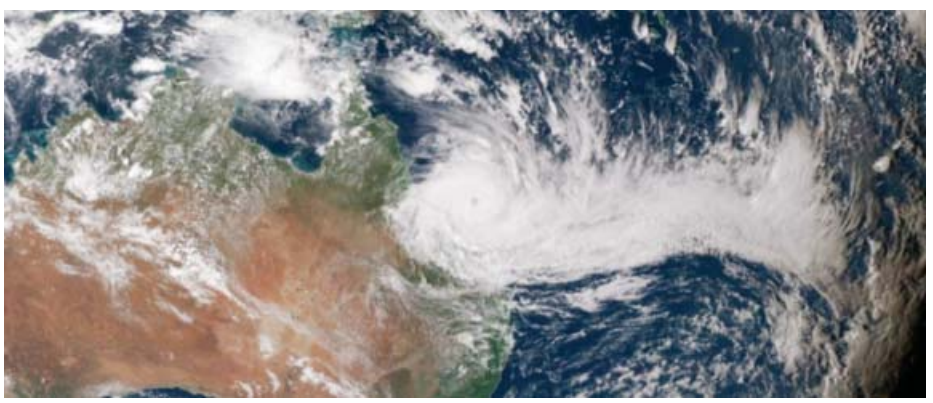

নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব

নিরক্ষীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে গেলে উষ্ণ এবং আর্দ্র বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য মেরু অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণে নিরক্ষরেখার দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাবে সৃষ্ট করিওলিস শক্তির কারণে এই বায়ু সোজাসোজি প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁদিকে বেঁকে যায়। এই জন্য আমরা দেখি, উত্তর গোলার্ধে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকে। নিরক্ষরেখার উপর এই শক্তির প্রভাব শূন্য। কাজেই, এই অঞ্চলের তাপমাত্রা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অনুকূলে থাকলেও, করিওলিস শক্তি নূন্যতম থাকায়, নিরক্ষরেখার শূন্য ডিগ্রি থেকে পাঁচ ডিগ্রির মধ্যে কোনও ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায় না। সাধারণত, নিরক্ষরেখার ১০ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রির মধ্যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।

বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা

বায়ুমণ্ডলে নিম্ন ও মধ্যস্তরে অধিক আর্দ্রতা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিরাজমান বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি

ঘূর্ণিঝড় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। সমুদ্রে আগে থেকে বিরাজমান বিক্ষুব্ধ কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, ঘুর্ণঝড় সাধারণত সেটাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এছাড়া, পশ্চিমমুখী নিম্ন বায়ুচাপ সম্পন্ন স্রোত, আবহাওয়ায় উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গতি ও দিকের স্বল্প পরিবর্তন এবং দ্রুত শীতলীকরণের ফলে নির্গত তাপ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সহায়ক।